অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা। কারণ আপনারা ভালোবাসলে তবেই আমাদের পথচলা সার্থক।

আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতে -

মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com

যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন - দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পিন-৭১২৬০১

কেউ কেউ বলে থাকেন, তিনি বাংলার 'দ্বিতীয় বুদ্ধদেব বসু'। কবি হিসেবে তিনি নয়ের দশকের উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। তাঁর সম্পাদিত আদম পত্রিকা ও আদম প্রকাশনা বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের নবতর সংযোজন। তিনি কবি, শিক্ষক, সম্পাদক ও প্রকাশক। নিজস্ব মননভূমিতে তিনি যতটা কড়া, ব্যক্তি হিসেবে তিনি ততটাই অমায়িক, অমলিন। সম্মানিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ বিশেষ সম্মাননাসহ অসংখ্য সম্মাননায়। আর্থিক লিপি'র পাতায় এবার রইল এই গৌতম মণ্ডলের দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্ব।

আজ পর্ব ২

প্রতিটি পথে আলো জেগে আছে ঃ গৌতম মণ্ডল

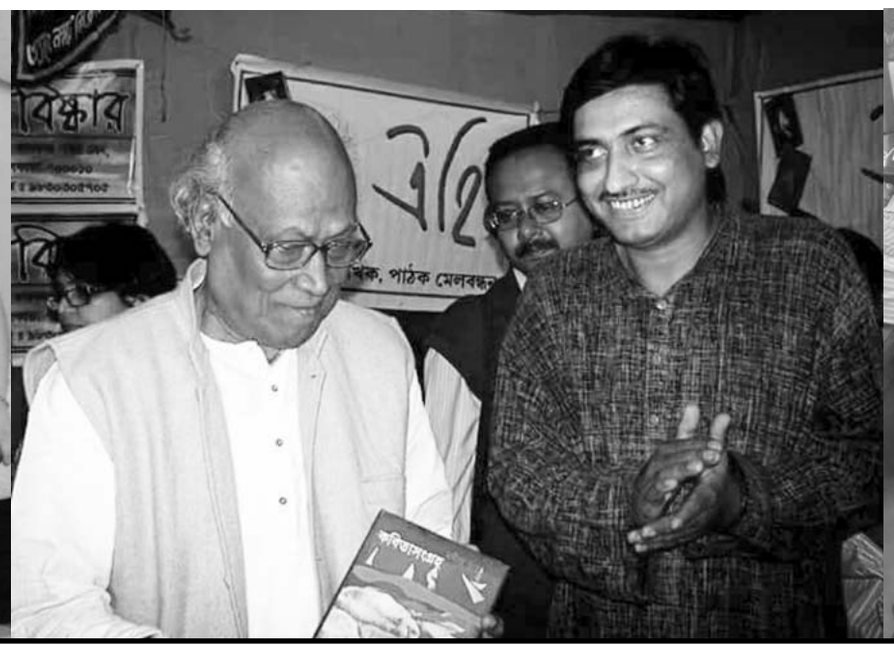

লিপি : আপনার একদম শেষ কবিতার বই, খুব সম্ভবত, 'বিবাহের মন্থর আয়োজন'। বইটি পড়তে গিয়ে অদ্ভুত এক ঘোর কাজ করে। অন্য রকমের উচ্চারণ। অন্যরকমের দর্শন। আপনার সময়ে অনেক নেকু পুসু কবিতা লেখা হয়েছে। সেগুলো, যেমন পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে, তেমনি বাণিজ্যসফলও হয়েছে। আপনার কবিতা, নয়ের দশকের গোটা বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কবির স্বরায়ন ও কবিতার পণ্যায়ন বিষয় আপনার মতামত কী?

গৌতম মণ্ডল : সব দশকেই মাইনর কবিরা অনেকেই গুরুত্ব পেয়েছে। জীবনানন্দ দাশের সময়েও আমরা তা দেখেছি। কিন্তু প্রধান কবিরাও, সবাই নয়, কেউ কেউ আমরা দেখেছি, কম বেশি আলোচিত হয়েছে। পাঁচের দশকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশাপাশি উৎপলকুমার দত্তও বিভিন্ন জায়গায় আলোচিত হয়েছেন। আবার যথেষ্ট কবিতা লিখেও ততটা আলোচিত হননি প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, আলোক সরকার আর শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়। ষাটের দশকে আমরা দেখছি, ভাস্করদা, ভাস্কর চক্রবর্তী যথেষ্ট পাঠক পেয়েছেন। সাতের দশকে সবচাইতে খ্যাতিমান কবি জয় গোস্বামী। তাঁর কবিতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা বাতুলতা। তিনি, কোনও সন্দেহ নেই, উত্তর জীবনানন্দ যুগের একজন প্রধান কবি। তবে তিনি যেসব কবিতার জন্য সাধারণ পাঠকের কাছে মান্যতা পেয়েছেন সেগুলো খুবই সাধারণ মানের। সাতের দশকে অনেক মাইনর কবিকেও মঞ্চ আলোকিত করতে দেখা যায়। আলাদাভাবে তাঁদের নাম বলছি না। তবে এই সময়েও সিরিয়াসলি যাঁরা কবিতা লিখতে চেয়েছেন, লিখেছেনও, তাঁরাও পাঠকের ভালবাসা পেয়েছেন। ধরো, দেবদাস আচার্য, গৌতম বসু, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, নির্মল হালদার, সুধীর দত্ত। আরও আছেন, সবার নাম আলাদা করে বলছি না। তবে সাতের দশকের পর থেকে ছবিটা বদলাতে থাকে। কবিতায় কায়েম হতে থাকে সিণ্ডিকেটরাজ। নয়ের দশকে সিণ্ডিকেটরাজ প্রবল আকার ধারণ করে। ফলে যাঁরা নয়ের দশকের প্রধান কবি হিসাবে পরিচিতি পেয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশ, বলতে দ্বিধা নেই, সিণ্ডিকেটের প্রোডাক্ট। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে এপার বাংলায় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ক্ষেত্রে আজ সিণ্ডিকেটই প্রধান ফ্যাক্টর। সিণ্ডিকেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সফলতা পাওয়া বেশ কঠিন। দুষ্কর বলা চলে। তবে আমার বিশ্বাস, সিন্ডিকেট সত্য হলেও, শেষ সত্য নয়।

লিপি : বাংলা কবিতা থেকে পাঠক আজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। মিডিয়া, তাদের টিআরপি ও অর্থের জন্য অপেক্ষাকৃত অনেক দুর্বল কবিকে প্রমোট করছে। তাদের লেখা হাতের নাগালেই পাওয়া যায়। তুলনায় দেবদাস আচার্য, প্রবীর রায়, শ্যামল সিংহ, গৌতম বসু এতটা সহজলভ্য নয়। আপনার কি কোথাও মন হয় না, আমাদের বিচ্ছিন্নতা থেকেই এই সিণ্ডিকেটগুলো গড়ে উঠেছে? আজ লিটিল ম্যাগাজিনের অবস্থা দেখুন। এত এত লিটিল ম্যাগাজিন, অথচ কবিতা সিসিফাস রোগে আক্রান্ত। এই মুহূর্তে আমাদের কী করণীয় বলে আপনার মনে হয়? প্রতিরোধ? নাকি প্রতিকার? কিন্তু কী উপায়ে তা সম্ভব?

গৌতম মণ্ডল : সিন্ডিকেট ব্যাপারটা আগে ছিল না, তা কিন্তু নয়। জীবনানন্দ দাশের সময় থেকেই ছিল। পাঁচের দশক থেকে সিণ্ডিকেট ব্যাপারটা প্রবল হতে শুরু করে। কৃত্তিবাস পত্রিকা প্রথম দিকে বেশ ভালই ছিল, নতুন নতুন কবিদের কবিতা গুরুত্ব সহকারে ছাপা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কৃত্তিবাস ক্রমশ সিণ্ডিকেট হতে শুরু করে। পুরো ব্যাপারটা গোষ্ঠীবদ্ধতায় পরিণত হয়। নিজেদের পরিচিত, যাঁরা সম্পাদকের কাছে আসেন, তাঁরাই সবকিছুতে গুরুত্ব পেতে থাকেন। তাঁরা পুরস্কৃত হতে থাকেন। তাঁদের কবিতা অন্য ভাষায় অনুবাদ হয়, দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁরা বাংলা কবিতার প্রতিনিধি হয়ে কবিতা পাঠ করেন। অথচ পাঁচের দশকেরই কবি শম্ভু নাথ চট্টোপাধ্যায়, এমনকি আলোক সরকার থেকে যান অন্ধকারে। প্রত্যেক দশকে কম বেশি এইরকম কবি রয়েছেন, যাঁরা উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেও অনালোকিত থেকে গেছেন। ছয়ের দশকে ভাস্করদা যথাযথ মর্যাদা পেলেও গীতা চট্টোপাধ্যায়, মানিক চক্রবর্তী, অশোক দত্তচৌধুরী এবং অরুণ বসু কোনও গুরুত্বই পাননি। সাতের দশকের ক্ষেত্রে এই তালিকাটা দীর্ঘ। তবে, আশার কথা, দেরিতে হলেও দেবদাস আচার্য, গৌতম বসু, নির্মল হালদার, অনুরাধা মহাপাত্র, নিত্য মালাকার, গৌতম চৌধুরী কিছু পাঠক পেয়েছেন। একেবারেই পাঠক পাননি অশোক দত্ত, হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস তরফদার, অমিতাভ মণ্ডল, প্রভাত সাহা, বিজয় দে-এঁরা। আসলে পরবর্তীকালে সিণ্ডিকেটের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এখন যেমন কবিতার প্রায় পুরো পরিসরটাই সিণ্ডিকেটের দখলে। একটা নয়, অনেকগুলো সিণ্ডিকেট। কীভাবে? ধরো তুমি একটি দৈনিকের সাংস্কৃতিক পাতাটা দেখো। তুমি কী করতে শুরু করলে, যেসব পত্রিকা তোমার কবিতা ছাপে বা তোমাকে সম্বর্ধনা দেয়, তুমি শুধু তাঁদের, অর্থাৎ সেই পত্রিকার বা সেই প্রকাশনার খবর ছাপলে, সেসব পত্রিকা বা বইয়ের রিভিউ করলে। এর ফলে তোমাকে ঘিরে তৈরি হল একটা অশুভ চক্র। সিণ্ডিকেট। ঠিক একইভাবে কোনও বাণিজ্যিক কাগজের যিনি কবিতা বিভাগটা দেখেন, তিনিও তাই করতে শুরু করলেন। যাঁরা যাঁরা তাঁকে প্রধান অতিথি করে ডেকে নিয়ে যান তিনি মূলত তাঁদের কবিতা ছাপতে শুরু করলেন, অন্যদের নয়। এইভাবে এখন অনেকগুলো সিণ্ডিকেট তৈরি হয়েছে। এদের নিজেদের মধ্যে আবার বোঝাপড়া আছে। অর্থাৎ আমাকে তুমি দেখো, তোমাকে আমি দেখব। এইরকম পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে দরকার, বুদ্ধদেব বসুর মতো এক বা একাধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সম্পাদক। যিনি শুধু লেখাটাই বিবেচনা করবেন, অন্য কিছু নয়। দরকার ডি কে-র মতো রুচিসম্পন্ন একজন প্রকাশক। যিনি উৎকৃষ্ট বই ছাড়া অন্য কিছুই ছাপবেন না। এখন যদি আমরা বুদ্ধদেব বসু বা ডি কে-র মতো কাউকে না পাই, তাহলে কী করব? কোনোদিকে না তাকিয়ে নিজের মতো করে নিজের লেখাটা লিখে যেতে হবে। ধারাবাহিক উপেক্ষা সহ্য করার মতো মানসিকতা অর্জন করতে হবে। অক্ষরের ভিতর যদি শক্তি থাকে, আলো থাকে, তাহলে, আমার বিশ্বাস, একদিন না একদিন, তা করো কাছে মর্যাদা পাবে। পাবেই।

লিপি : বাংলা কবিতায় সিণ্ডিকেটের বাইরেও সমস্যা রয়েছে গৌতমদা। পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়ি। এর পিছনে আমাদের সংকীর্ণতাই বোধহয় বেশি পরিমাণ দায়ী। সিণ্ডিকেটের বাইরেও ধরুন, এখন বাংলা কবিতা বিশেষ কয়েকটি ধারায় বিভক্ত। উত্তর আধুনিক, নতুন কবিতা, ভাষা বদলের ছায়া। এদের একপক্ষ অনেক সময় মনে করেন, অপর পক্ষ কিছুই করছেন না, কবিতার কিছুই বোঝেন না। নিঃসন্দেহে তাঁরা দারুন কাজ করছেন। বাংলা কবিতাও সমৃদ্ধ হচ্ছে। এই ইজম্‌গুলো সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?

গৌতম মণ্ডল : কবিতায় আমি ইজম ব্যাপারটাকে আলাদা করে গুরুত্ব দিই না। কবিতা কবিতাই। হয় কবিতা হয়েছে অথবা তা হয়নি। তবে ইজমের নাম করে যদি বিভিন্ন ধরনের কবিতা লেখা হয়, সেটা মন্দ নয়। যে ভাষার কবিতায় যত বৈচিত্র বেশি সে ভাষার কবিতা তত বেশি সমৃদ্ধ। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ঠিক, জোর করে আলাদা হওয়া যায় না, আর আলাদা হওয়ার জন্য ইজম্ বা স্বঘোষিত আন্দোলনের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। জীবনানন্দ দাশের কি নিজের কবিতা নিয়ে আলাদা করে কোনো নাম দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল? হয়নি। অথচ তাঁর কবিতা সময়ের থেকে কত এগিয়ে, কত আধুনিক এবং নতুন। কবিতার যাঁরা আলাদা আলাদা নাম দিয়ে নিজেদের আলাদা করতে চাইছেন, তাঁরা তা করতেই পারেন, কিন্তু পাঠক হিসেবে আমাকে দেখতে হবে তা আদৌ নতুন কিনা। শুধু বাইরের আবরণ পালটে কিন্তু নতুন হওয়া যায় না। আরেকটা কথাও মনে রাখতে হবে, কবিতার আত্মা বলে একটা জিনিস আছে তা কিন্তু কোনও জবরদস্তি সহ্য করে না।

লিপি : বাংলা কবিতায় আরও একটি বিশেষ প্রবণতা সম্পর্কে আপনার মুখ থেকে কিছু কথা শুনতে চাই। এক শ্রেণির কবি ধামাধরা সম্প্রদায়ের। তাঁরা বিখ্যাত কবিদের নানা রকমের ফাইফর্মাস খাটেন। এরাই সেই কবির নানা অনুষ্ঠানে ডাক পান, মঞ্চ পান, পুরস্কার পান। অথচ দেখবেন, এদের ভেতরে কবিতাটাই নেই। দেখবেন বিখ্যাত সব কবিদের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে ফেসবুকে ছবি পোস্ট করেছেন। আরে! আমরা কী দেখবো? আপনার সঙ্গে কার পরিচয় আছে, সেটা? নাকি আপনার কবিতাটা? এবিষয়ে গৌতম মণ্ডলের অবস্থান জানতে চাই।

গৌতম মণ্ডল : তা তো বটেই। কবিতাই বিচার্য হওয়া উচিত। তবে এঁদের সম্পর্কে কিছু না ভাবাই শ্রেয়।

লিপি : এবার আপনার কথায় আসি। আপনার বেশিরভাগ কবিতা মন্ত্রের মতো। যেনো কিছু একটা 'নেই' কে 'আছে' তে রূপান্তরের প্রচেষ্টা। হয়তো, এর ফাঁকে অনেকেই এলিয়টকে খুঁজবেন কিংবা টমাস হার্ডিকে। আমরা খুঁজে পাই আমাদের বন্ধুকে। চূড়ান্ত ব্যর্থতার গ্লানিময় দিনে, আপনার কবিতা আমাদের বন্ধু হয়ে ওঠে। কানের কাছে এসে কেউ যেন ফিসফিসিয়ে বলে ''শূন্য থেকে শুরু করো / তুমি শুরু করলেই / কাঁঠাল গাছ তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে... কিংবা 'প্রতিটি পথে আলো জেগে আছে।' কিন্তু এই বন্ধুই আবার আমাদের দিচ্ছে অন্য শিক্ষা 'তুচ্ছ গুবরে পোকাকেও এখন বেশ সুন্দর লাগে। আনমনে তাদের সঙ্গে কথা বলি, হাঁটি... ' এই বন্ধুত্বের অর্থ কি বিশ্বাস-অবিশ্বাস? মেট্রোপলিটন মনের ভাঙন?

গৌতম মণ্ডল : 'ভূ পাখি ভস্মপাখি'তে যেন অবচেতন ও বিমূর্ততার জগৎ দেখা যায়, পরবর্তীকালে আমার লেখা কিছুটা সরে আসে। 'দুর্লভ শিখরদেশ' সেই সরে আসার প্রথম সিঁড়ি। তবে দুর্লভ শিখরদেশেও রয়েছে অবচেতন, উলম্ফন, নির্মূর্ততা ও যৌনতার প্রচুর অনুষঙ্গ। 'অলসরঙের টিলা'য় কিন্তু আমার জগৎ অনেকটা শান্ত হয়ে আসে। জগতে তো মালিন্যর দিক রয়েছে অনেক, কিন্তু মন আর তা দেখতে চায় না। তাই 'অলসরঙের টিলা' বা 'বিবাহের মন্থর আয়োজন' এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে এক ধরনের স্নিগ্ধ আলো। হ্যাঁ, আলোই এইসব কবিতার প্রধান অবলম্বন। আর যা আছে তা প্রকৃতি। এখানেই প্রকৃতি আলাদাভাবে আসেনি। সেও কবিতার চরিত্র। সেজন্যই তুমি শুরু করলে 'কাঁঠাল গাছ তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে।' প্রতিটি পথে আলো জেগে আছে বলেই তো আর গুবরে পোকাকে তুচ্ছ মনে হয় না, মনে হয় কেউ না আছে তো কী, আনমনে তাদের সঙ্গে কথা বলি, হাঁটি। আজকের তীব্র অশান্তি ও গ্লানিময় সময়ে আমার মনে হয়, পাঠক এর ভিতর অবগাহন করলে একটা শান্ত নিরিবিলি জগৎ পেতে পারেন। এই জগৎ আসলে তো বন্ধুই। সেজন্যই হয়ত তুমি কবিতাগুলির ভিতর খুঁজে পেয়েছ একজন বন্ধুকে।

লিপি : কিন্তু, রাত ও রাতের বিভায় একধরনের চাপা অস্থিরতা কাজ করেছে।

গৌতম মণ্ডল : যে অস্থিরতার কথা বলছ, তা উজাগর আঁখি থেকে 'ভূপাখি ভস্মপাখি', এমনকি 'দুর্লভ শিখরদেশ' পর্যন্ত পাবে।

লিপি : অনেকেই আফসোস করেন, ইস্, গৌতমদার মতো যদি চোহারাটা থাকতো, তাহলে কলেজ লাইফটা বেশ জমিয়ে দিতাম। বলি কী, দেখা কি হয়েছিল, 'তাহার সাথে'?

ক্রমশ

ক. বি. তা.

ক্রোড়পত্র

অভিজিৎ দত্ত

রমণের পর যে নারী, বর্ষণমুগ্ধ, দেখতে পায়;
শরীর-ভরা জোনাকির বন্ধ্যা-আলো,
নীল পদ্ম ফুটেছে দুধ সরোবরে, শিবকল্প ওই চাঁদ,
— অল্প হিম, হিমসন্ধ্যা...
শীতজলে নেমে সদ্য ফোটা দু-একটি পদ্ম তুলে নিতে গিয়ে
পায় পদ্মগোখরোর ক্ষমা—
বাঘের সহিস হয়ে ফেরে পুনশ্চ রমণমুদ্রায়
— সে-ই তো অসীমা,
তার পায়ের আলতারেখা ধরে পৌঁছে যাওয়া যায়
প্রতিটি শব্দের সীমায়

কবিতায় জেগে ওঠে পাতাবাহারের আলো...
কবির মৃত্যুর পর, ক্রোড়পত্র সেই আলো খায়।

সম্পর্ক

অপর্ণা দেওঘরিয়া

প্রতিটি মুহূর্তে ডাক দেয় অভিমানী সম্পর্ক
মিলনের মেঘমালা, বন্ধনের ফাঁক ফোঁকর খোঁজে
পাতা ঝরানোর গানে চলমান রৌদ্রলতায়
আজন্ম উল্লাসের গল্প সাজায় মনে প্রাণে।

যাপন সুখে তোমার ফেসবুক রঙিন হয়
সত্য ও মিথ্যার খেলা, অম্লান চিরন্তন নদী
জীবনের শূন্যতায়, পূর্ণতার ছক্কা খেলায়
শ্বাপদের মতো বিষণ্ণতার আলো খোঁজে।

তোমার সাফল্যের মই, প্রেমের পৃথিবী
স্রোতস্বিনীর দহনে পিপাসার একতারায়
উদভ্রান্ত অপেক্ষার পাহাড়, আলিঙ্গনে
ভালোবাসার বৃষ্টিতে অহরহ ভেজে—
অজস্র ধারায়।

দুরন্ত রোদ

স্বাগতা সানি ঘোষ

সকালে সারা শরীরে মেখে নিই
জ্বালা যন্ত্রণারা বুঝি শেষ
দু-হাতে আলিঙ্গন করি
বেলা বাড়ে, আর ভালো লাগে না
জ্বলে পুড়ে শেষ হই।

জল পান করো দ্রুত
স্রোতহীন হয় নদী
সবাইকে জ্বালিয়ে
নিজেও জ্বলো।
অরণ্যে বিহঙ্গ বিহঙ্গিনীর কান্না
সব লাল।

ঝাপসা পথ পথিকের
থমকে যাওয়া দিন
বসে থাকে আলো ছায়ার মাঝে
মাঠ ছেড়ে ঘরে ফেরে চাষি।

উষ্ণ হাওয়া মেখে নিই
উদাসী বিকেলে
তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিই
তপ্ত হাওয়ায় ধুলো মাখি
ছুটে যাই তোমার কাছে
দিনের শেষ সূর্য গায়ে মাখব বলে।

গীতবিতান

দেবাংশু চক্রবর্তী

একলা এসেছি, একলাই চলে যাব। কাকে আর সঙ্গে করে নিয়ে যাব অনন্ত পরবাসে। এখনও যে দেওয়াল জুড়ে নিবিড় অহঙ্কারে সাজিয়ে রেখেছি আমাদের মৌন অভিমান, আমাদের সঞ্চয়, আমাদের বৃষ্টি, খরা, জলচ্ছ্বাস, ওদেরও ফেলে রেখে যাব। খসে পড়বে বর্ম, খসে পড়বে নিরুক্ত আটপৌরে মুহূর্ত, খসে খসে পড়বে জল, সযত্নে সাজানো ত্বক, ত্বকের নিচে জীবন। হাত বাড়িয়ে কে আর বলবে, নিয়ে চলো। শুধু তুমি ডুবে যাওয়ার ভয়ে একবার যেভাবে আমার হাত জড়িয়ে ধরেছিলে, সেইভাবেই আপ্রাণ জড়িয়ে ধরবে গীতবিতান।

কারণ, বাকি কথা একমাত্র সেই তো জানে।